

শাউয়াল মাসের আমল

আরবী বছর বা হিজরী বছর অনুযায়ী রমায়ান মাসের পরের মাস হলো শাউয়াল মাস। এই মাসকে “শাউয়ালুল মুকাররম” বলা হয়। এই মাসে আমলের সাথে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

প্রথম আমলঃ শাউয়াল মাসের রোযা

যে ব্যক্তি রমায়ান মাসের রোযা পালনের পর শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখবে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল।

প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রমায়ানের রোযা রাখার পরে-পরেই শাউয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখে, সে যেনো পূর্ণ এক বছর (৩৬০ দিন) রোযা রাখার সমান সওয়াব লাভ করে। (মুসলিম ১১৬৪, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ।)

এই সওয়াব এই জন্য যে, উম্মতে মুহাম্মাদির যে কেউ একটি ভালো কাজ করলে আল্লাহর অনুগ্রহে সে তার ১০ গুণ সওয়াব পাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “কেউ কোনো ভালো কাজ করলে সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে।” (সূরা আল-আন‘আম, আয়াত ১৬০)

অতএব, এই ভিত্তিতে $৩০+৬ = ৩৬$ টি রোযা রাখলে $৩৬ \times ১০ = ৩৬০$ অর্থাৎ চন্দ্র মাস অনুযায়ী সারা বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যাবে।

আল্লামা ইবনে রজব রহ. বলেন, শাউয়াল মাসে রোযা রাখার তাৎপর্য অনেক। রমায়ানের পর শাউয়ালে রোযা রাখা রমায়ানের রোযা কবুল হওয়ার আলামত স্বরূপ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা কোন বান্দার আমল কবুল করলে, তাকে পরেও অনুরূপ আমল করার তৌফিক দিয়ে থাকেন। নেক আমলের প্রতিদান বিভিন্নরূপ। তার মধ্যে একটি হলো পুনরায় নেক আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করা। তাই নামাজ রোযা ও অন্যান্য ইবাদত বাকি এগার মাসেও চালু রাখা চাই। কেননা যিনি রমায়ানের রব, বাকি এগার মাসের রব তিনিই।

তিনি আরো বলেন, তবে ইবাদতের মোকাবেলায় গুনাহের কাজ করলে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অতএব, কোন ব্যক্তি রমায়ানের পরপরই হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে, তার সিয়াম স্বীয় মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। এবং রহমতের দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

গুনাহের পর ভাল কাজ করা কতইনা উৎকৃষ্ট আমল। কিন্তু তার চেয়ে আরো উৎকৃষ্ট আমল হলো নেক কাজের পর আরেকটি নেক কাজে মশগুল হওয়া। অতএব, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, যাতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত হকের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করেন। সাথে সাথে অন্তর বিপথে যাওয়া থেকে পরিত্রাণ চাও। কেননা আনুগত্যের সম্মানের পর নাফরমানির বেইজ্জতি কতইনা নিকৃষ্ট।

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রমায়ানের রোযা দশ মাসের রোযার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোযা দু’মাসের রোযার সমান। সুতরাং এ হলো এক বছরের রোযা।

অপর রেওয়াজেতে আছে, যে ব্যক্তি রমায়ানের রোযা শেষ করে শাউয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখবে সেটা তার জন্য পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য। (সূরা আন‘আম আহমদ : ৫/২৮০, দারেমি : ১৭৫৫)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে শাউয়াল মাসের ৬ রোযা রেখে সারা বছর রোযা রাখার সমান সাওয়াব পাওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

দ্বিতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসে বিবাহ করা

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “বান্দা যখন বিবাহ করল তখন তার দ্বীনদারী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে গেল। অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করতে থাকে।” (মিশকাত শরীফ -২৬৭)

মানুষের অধিকাংশ গুনাহ দুটি কারণে সংঘটিত হয়। একটি হয় তার লজ্জা স্থানের চাহিদা পূরণের কারণে আর অন্যটি হয় পেটের চাহিদা পূরণের কারণে। বিবাহের কারণে মানুষ প্রথমটি থেকে হেফাজতের রাস্তা পেয়ে যায়। সুতরাং তাকে কেবল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তাশ্রিত থাকতে হয়। যাতে করে সে হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারে। একজন লোক খুব বড় আবেদ, তাহাজ্জুদ-চাশত-আওয়াবীন ইত্যাদি নফল নামায খুব পড়ে; কিন্তু সংসারের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। আরেকজন লোক ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করে এবং বিবি বাচ্চার হক আদায়ে তৎপর থাকে ফলে তার বেশী বেশী নফল পড়ার কোন সময় হয় না। এতদসত্ত্বেও শরী‘আত কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই ইবাদাতগুজার হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মুতাবিক বিবাহ-শাদী করে পরিবারের

দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হালহাল রিযিকের ফিকির করছে, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল যে চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদে পড়ে থাকে বা বনে জঙ্গলে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে আর সব রকমের সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকে।

বিবাহের অন্যতম আরো একটি ফায়দা হচ্ছে এই যে, এর দ্বারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালন করা হয়। কেননা, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ “বিবাহ করা আমার সুন্নাত।” আরেক হাদীসে এসেছেঃ “তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বিবাহ কর। কারণ এর দ্বারা দৃষ্টি ও লজ্জা স্থানের হেফাজত হয়।” (মিশকাত শরীফ- ২৬৭ পৃঃ)

এছাড়াও বিবাহের দ্বারা মানুষ নিজেকে অনেক গুনাহের কাজ থেকে বাঁচাতে পারে। নেক আওলাদ হাসিল করতে পারে। আর নেক আওলাদ এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরে কঠিন অবস্থার উত্তরণে পরম সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। কারো যদি নেক সন্তান থাকে তাহলে তারা যত নেক আমল করবে, সেগুলো পিতা-মাতার আমলে যোগ দেয়া হবে। বিবাহ-শাদী যেহেতু শরী‘আতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত, সেহেতু এর মধ্যে কোনভাবে গুনাহ এবং আল্লাহ তা‘আলার নাফরমানীর কোন সংমিশ্রণ না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া এতে বেপর্দা, নাচ-গান, অপব্যয়-অপচয়, ছবি তোলা, নাজায়িয় দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতে হবে। নতুবা মুবারক বিবাহের সমস্ত বরকতই নষ্ট হয়ে যাবে এবং স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি সূচনাতাই ধ্বংস হয়ে যাবে। (মিশকাত শরীফ- ২/২৬৮)

বিবাহ সম্পর্কিত কিছু হাদীস

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ পাক আবশ্যিক মনে করেন -

- (১) ঐ মুকাতাব বা দাস যে নিজের মুক্তিপণ আদায় করতে চায়।
- (২) ঐ বিবাহকারী যে আপন চরিত্র রক্ষা করতে চায় এবং
- (৩) ঐ মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। (তিরমিযী শরীফ, মিশকাত-২৬৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার আভিজাত্যের কারণে বিবাহ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার অপমান ও অপদস্থতা অধিক হারে বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের কারণে তাকে বিবাহ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার দারিদ্রতাকে (দিনে দিনে) বৃদ্ধি করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ করবে তার বংশ কৌলীন্য দেখে, আল্লাহ তা‘আলা তার তুচ্ছতা ও হেয়তা বাড়িয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে শুধুমাত্র এই জন্য বিবাহ করে যে, সে তার চক্ষুকে অবনত রাখবে এবং লজ্জা স্থানকে হেফাজত করবে অথবা (আত্মীয়দের মধ্যে হলে) আত্মীয়তা রক্ষা করবে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলা সেই নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনেই বরকত দান করবেন। (তাবারানী)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নারীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে (২) তার বংশ মর্যাদার কারণে (৩) তার সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। সুতরাং তুমি দীনদার বিবি লাভ করে কামিয়াব হও। তোমাদের হস্তদয় ধ্বংস হোক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও (যদি দীনদার ব্যতীত অন্য নারী চাও)। (বুখারী-মুসলিম, মিশকাত-২৬৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ, আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল নেককার বিবি। (মুসলিম শরীফ, মিশকাত- ২৬৭)

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীনদারী ও আখলাক তোমরা পছন্দ কর, তখন বিবাহ দিয়ে দাও। (মাল সম্পদের প্রতি লক্ষ্য কর না) তা যদি না কর তাহলে দেশে ব্যাপকহারে ফেতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ- ২৬৭)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ সর্বাপেক্ষা বরকতপূর্ণ বিবাহ হলো, যা সর্বাপেক্ষা কম খরচে সম্পাদিত হয়। (বাইহাকী, মিশকাত শরীফ- ২৬৮)

বিবাহের স্থান ও কাল

বিবাহের জন্য উত্তম হলো জুমু‘আর দিন। পঞ্জিকায় যে শুভ অশুভ সময় লেখা আছে, সেটা হিন্দুদের তরীকা। শরী‘আতের দৃষ্টিতে যে কোন মাসে, যে কোন দিনে এবং যে কোন সময়ে বিবাহ বৈধ। তবে শাউয়াল মাসে এবং জুমু‘আর দিনে বিবাহ করা সুন্নাত। (ফাতাওয়া শামী-৩/৮)

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মুসলমানদের বিবাহ মসজিদেই সম্পন্ন হত। আর এটা নবীজীর সুন্নাতও বটে। শাউয়াল মাসে বিবাহ করা আরেকটি সুন্নাত। সুতরাং কারো পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে সে শাউয়াল মাসের জুমু‘আর দিনে বিবাহ করবে।

আর সম্ভব না হলে অন্য যে কোন সময়ে করতে পারে। তবে সম্ভব হলে মসজিদ ও জুমু'আ ঠিক রাখবে, এটাও সম্ভব না হলে দুটোর কোন একটা ঠিক রাখতে চেষ্টা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ খায়ের ও বরকত থেকে মাহরুম হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদের বিবাহে সুবিধা হলো, এতে কোন ফালতু খরচ হয় না। বিছানা-পত্র এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দাবী-দাওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের জায়গা, সেখানে মানুষ ইবাদত করতে আসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ করতে আসে। কাজ শেষ হলেই চলে যায়। (মিশকাত শরীফ -২/২৭১, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-৩/২৬৫)

বিবাহের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসুরুল হক সাহেবের (দা.বা.) “ইসলামী বিবাহ” কিতাবটি।

বি.দ্র. কেউ যদি শাউয়াল মাসের নিকটবর্তী সময়ে বিবাহ করার জন্য তৈরী থাকে তবে তার জন্য পারমর্শ হলো সে যেন শাউয়াল মাসের অপেক্ষা করে কিন্তু কারো বিবাহ যদি ২/৩ মাস আগে বা পরে ঠিক হয় তবে তার জন্য শাউয়াল মাস অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিক বিবাহ করা উচিত।

তৃতীয় আমলঃ শাউয়াল মাসে হজ্জের প্রস্তুতি

এই মাসের আরেকটি আমল বা কাজ হলো হজ্জের প্রস্তুতি নেয়া। হজ্জের জন্য যারা নিয়ত করেছে তাদের কাজ হলো তারা যেন হজ্জের যাবতীয় মাসআলা মাসাইল শিক্ষা করে।

হজ্জের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন হযরত মুফতী মনসুরুল হক সাহেবের (দা.বা.) “কিতাবুল হাজ্জ” কিতাবটি।

শাউয়াল মাসের শিক্ষাঃ সুহবাত

শাউয়াল মাসের শিক্ষা হলো সুহবাত। রমায়ান মাসের সুহবাতের কারণে শা'বান মাস এবং এই শাউয়াল মাস এতো দামী হয়েছে। সুহবাতের কারণে এই মাসকে “শাউওয়ালুল মুকাররম” বলা হয়। ঠিক তেমনি নেক লোকের সুহবাতের কারণেই মানুষও দামী হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সংসর্গে থাকো। (সূরা তওবা, আয়াত ১১৯, পারা ১১)

হযরত হানযালা রাযি. (একটি দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেন, আমরা যখন আপনার (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র খেদমত হতে চলে আসি, তখন পরিবার-পরিজন, কাজ-কারবার ও সম্পত্তির মধ্যে ডুবে যাই এবং অনেক বিষয়ের খেয়ালও থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যে অবস্থায় তোমরা আমার নিকট থাকো, যদি এই অবস্থা বা যিকিরে নিমগ্নতা স্থায়ী হয়, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় এবং পথে মুসাফাহা করতে থাকবে। কিন্তু হে হানযালা! কেমন একেকটি মুহূর্ত! কেমন একেকটি মুহূর্ত! তিনি এই কথাটি তিনবার বললেন।’ (মুসলিম-৭১৪২ ও তিরমিযী)

সাহাবায়ে কেলাম সকলেই আলেম ছিলেন না, কিন্তু (সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও সর্বোচ্চ শেনীর মুহাদ্দেস, ফকীহ এবং বড় বড় ওলী-কুতুবের উপর স্বীকৃত। এই মর্যাদা নির্ভর করে একমাত্র নবীজীর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের উপর) তাঁরা যা কিছু লাভ করেছেন, তা শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংসর্গের মাধ্যমেই পেয়েছেন। আল্লাহুওয়ালাগণ সদা-সর্বদা সুহবত বা সাহচর্যকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য মনে করেছেন। তাঁরা ইলমের প্রতি এতো মনোযোগ দেননি যতটুকু মনোযোগ দিয়েছেন সংসর্গের প্রতি।

অনেক এলেমওয়ালারা লোক কোন বড় আল্লাহর ওলীর সুহবতে যায়নি তো তিনিও গোমরাহ হয়েছেন বা দ্বীনের খেদমতে তেমন আঞ্জাম দিতে পারেন নি। অপরদিকে সাধারণ লোক বড় আল্লাহর ওলীর সুহবতে গিয়ে এমন দামী হয়েছেন যে পরবর্তীতে বড় বড় আলেম উনার সুহবতে থাকতে পারা সৌভাগ্য মনে করেছেন। যেমন বর্তমানে (১৪৩৭ হিঃ) পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আলেম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এবং পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা দারুল উলুম করাচীর মুহতামিম সাহেব মুফতী রাফী উসমানী দা.বা., উভয়েই যার সুহবতকে সৌভাগ্যের আলামত ভেবেছেন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ লোক। নাম, ডাঃ আব্দুল হাই রহ.। এই ডাঃ আব্দুল হাই রহ., গত শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ. এর সুহবতে থেকে নিজেই এত দামী বানিয়েছিলেন। সারা দুনিয়ার সমস্ত আলেম উনাকে ডাঃ আব্দুল হাই আরেফী হিসেবে জানেন। সুহবাতের বরকতে তিনি আরিফ বিল্লাহ হিসেবে খ্যাত। এমন বহু মানুষ সুহবাতের মাধ্যমে দামী হয়েছেন এবং হচ্ছেন। হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. বলেন, “সঙ্গ গুণে রঙ্গ আসে।” তাই আমাদের জন্য জরুরী হলো নেক লোকের সুহবতকে গণিমত মনে করে তাদের সাথে উঠাবসা করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন